ভারতের জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর আলো-আঁধারি

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

আমরা বাড়ছি। বাড়ছি। বেড়েই চলেছি। প্রতি মুহূর্তে ভারতবাসী বাড়ছে। উন্নতির নিক্তিতে নয়। নেহাতই সংখ্যা। সব বল্গা ছিঁড়ে ভারতবাসীর সংখ্যা দুর্বার গতিতে বেড়ে চলেছে।

প্রতি মিনিটে প্রায় চৌত্রিশ জন ভারতবাসীর জন্ম হচ্ছে। তিন সপ্তাহে প্রায় চন্ডীগড়ের সমান জনসংখ্যা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। গোটা ভূপালের সমান মানুষ যুক্ত হচ্ছে প্রায় প্রতি মাসে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ আর জাপানের মোট জনসংখ্যা যোগ করল তা মোট ভারতবাসীর প্রায় সমান হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৫ সাল নাগাদ চিনকেও টপকে গিয়ে আমরা পৃথিবীর মধ্যে জনসংখ্যায় সেরার শিরোপা পাব।

এই অপ্রতিরোধ্য জনবিস্ফোরণের শেকড় যদি আমরা খুঁজতে যাই, তাহলে পৌঁছতে হবে ১৯২১ সালে। সেই বছরের আদমসুমারিতেই প্রথম দেখা গেল, ভারতবর্ষের জন্মহারের তুলনায় মৃত্যুহার কমছে। অর্থাৎ মোট হিসেবে জনসংখ্যা বাড়ছে। এরপর থেকে বছর যত এগিয়েছে খাদ্য, পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা, চিকিৎসা, প্রযুক্তি সব কিছুর উন্নতিই আমরা কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছি। ফলে জন্মহার অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা গেছে। কিন্তু তার চেয়েও সুফল পাওয়া গেছে মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণে। লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে মানুষের গড় আয়ু। ১৯২১ সালে পুরুষ ও মহিলার ক্ষেত্রে ভারতবাসীর গড় আয়ু ছিল যথাক্রমে ১৯.৪ এবং ২০.৯ বছর। স্বাধীনতাকালীন সময় ১৯৫১-র আদমসুমারিতে এই আয়ু যথাক্রমে ৩২.৪ এবং ৩১.৭ বছর। ১৯৮১-তে তা বেড়ে দাঁড়ালো যথাক্রমে ৫৪.১ এবং ৫৪.৭ বছরে। আর সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য, ২০১৩-তে গড় আয়ু যথাক্রমে ৬৭.৫ এবং ৭২.৬ বছর।

সব উন্নত দেশই এখন জন্ম-মৃত্যুহারের মধ্যে এক সমতায় পৌঁছে গেছে। ১৯৮০-৮৫ সালেই অস্ট্রিয়া অর্জন করেছিল 'জিরো গ্রোথ'-এর শিরোপা। ব্রিটেন, ডেনমার্ক, সুইডেন, বেলজিয়ামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজার জনে এক জন। আরও এগিয়ে গিয়েছে জার্মানি আর হাঙ্গারির মতো ইউরোপের কিছু দেশ। তাদের দেশের মৃত্যুহার জন্মহারকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। ফলে তাদের জনসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান।

ভারতবর্ষের পক্ষে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতেও এই পর্যায়ের ধারে কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ ভারতে জনবিস্ফোরণের পেছনে প্রতি হাজারে জন্ম-মৃত্যু হারের মধ্যে জনা উনিশ-কুড়ির তফাতটাই শেষ কথা নয়। এর সঙ্গে আছে সংখ্যাতাত্ত্বিক আরও এক মারাত্মকক বারুদ।

আমাদের জনগোষ্ঠীর মাত্র ৪.৯ শতাংশ মানুষ ৬৫ বা তার বেশি বয়সের। আর অনুর্ধ ১৪ বছর বয়সী শিশু-বালক-বালিকার সংখ্যা মোট ভারতবাসীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ৩০.৮ শতাংশ। আগামী ১৫ বছরের মধ্যে এই এক-তৃতীয়াংশ নবীন ভারতবাসী সন্তান উৎপাদনে সক্রিয় হবে তাই নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যার নিশ্চিন্ততা এখনও দূর-অস্ত।

উন্নত দেশে বয়স ভিত্তিক বিভাজন এর ঠিক উলটো। তাই তাদের জনসংখ্যাও অনেক সুস্থিত। এই অবস্থায় পৌঁছনোর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। আগামী বছরগুলোতে জন্মনিয়ন্ত্রণের কর্মসূচীকে যদি আমরা সঠিক লক্ষ্য ও দ্রুতিতে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তাহলেও এই বয়স-ভিত্তিক বিভাজনের উন্নতি ঘটবে খুবই মন্থর গতিতে। ২০২১ সাল নাগাদ ষাটোর্ধ মানুষের আনুমানিক হিসেব দাঁড়াবে তখনকার মোট জনসংখ্যার ১১ শতাংশ।

সুতরাং আমরা বাড়ছি শধু নয়। আমরা বাড়ব। বেড়েই চলব এক চরম বিপর্যয়ের দিকে।

১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীন হল, তখন সাকুল্যে ৩৪.৪ কোটি ভারতবাসী। মাত্র ৩৪ বছরের মধ্যে যোগ হল আর এক ভারতবর্ষ। ১৯৮১ সালে ভারতবাসীর সংখ্যা ৬৮.৫ কোটি। নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতবাসীর সংখ্যা বেড়েছে ১৮.১ কোটি। ২০১১-র আদমসুমারিতে মোট জনসংখ্যা হল ১২১ কোটি।

আদার ব্যাপারি কেন জাহাজের খোঁজ নেবে

এই সব বড়ো বড়ো সংখ্যার হিসেব বা সংখ্যাতত্ত্বের কচকচি শুধু গবেষণা পত্রের পাতায় বা বিশেষজ্ঞের সেমিনার রুমে সীমাবদ্ধ রাখার আর উপায় নেই। এই সব অঙ্ক আর তত্ত্ব থাবা বসাচ্ছে আমাদের ঘর-গেরস্থালিতে, মিলেমিশে গেছে আমাদের রোজকার জীবনধারণের সঙ্গে, পৌঁছে গেছে আমাদের অস্তিত্বের মূলে। আপনার এবং আপনার সন্ততির সুযোগ-সমৃদ্ধি-সংগ্রাম সব নির্ভর করছে ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর ওপর।

এই কর্মসূচীর ব্যর্থতার কারণেই আপনাকে প্রাণ হাতে করে ট্রেন-বাসের পাদানিতে ঝুলে অফিস যেতে হয়। যথেষ্ট মাইনে সত্ত্বেও আপনার কর্মস্থলের কাছে কোনও মাথা গোঁজার ঠাঁই পান না।

এই কর্মসূচীর ব্যর্থতার কারণেই আপনার সন্তান দশ ক্লাসের ফাইনালে ভালো ফল করা সত্ত্বেও এগারো-বারোয় পছন্দসই জায়গায় ভর্তি হতে পারে না। আপনার পাড়ার ছেলেটি বি. এস. সি. পাশ করে বাড়ি বাড়ি ধূপ বিক্রি করে।

এই কর্মসূচীর ব্যর্থতার কারণেই ঝুপড়ি পরিবারের পঞ্চম সন্তান আজ হাতে তুলে নিল ভিক্ষের থলি বা ওয়ান-শটার। গ্রামের মা তার তৃতীয় কন্যা সন্তানের গলা টিপে আত্মঘাতী হল।

এই কর্মসূচীর ব্যর্থতার কারণেই ভারতবর্ষে ৭ বছরের বেশি বয়সী নিরক্ষরের সংখ্যা (৪০.৯ কোটি) পৃথিবীর অন্য যেকোনও দেশের চেয়ে বেশি। অপুষ্টি-জনিত কারণে ৪৮ শতাংশ পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর (৫.৬ কোটি) স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত।

আসলে এটাই স্বাভাবিক। এটাই ভবিতব্য।

এই গ্রহের ২.৪ শতাংশ জমিকে সম্বল করে ১৭.৫ শতাংশ মানুষকে আশ্রয় দিচ্ছে ভারতবর্ষ। ফলে খাদ্য পানীয়-বস্ত্র-বাসস্থানের মতো জীবনধারণের ন্যূনতম চাহিদাটুকু জোগাড় করার জন্যই কাড়াকাড়ি পড়ছে। অনেকের কাছেই তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে আমাদের সরকার ভারতবাসী পিছু যে খরচ করেন তাতে ক্রমাগত টান পড়ে যাচ্ছে। ইউনাইটেড নেশন মানব উন্নয়ন সূচকের যে বাৎসরিক তালিকা প্রকাশ করে তাতে, উন্নত দেশগুলোর কথা তো বাদই থাক, চীন-শ্রীলঙ্কা-ব্রাজিলের মতো দেশের চেয়েও ভারতবর্ষ বেশ খানিকটা পিছিয়ে।

অথচ স্বাধীনতার পর থেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারতর উন্নতি কিন্তু চোখ ধাঁধানো খাদ্য উৎপাদন এবং প্রযুক্তিতে ভারতের অবস্থান সারা বিশ্বের ঈর্ষার বিষয়। ভূমি সংস্কার ও কর্মসংস্থানে এই দরিদ্র, শোষিত দেশ যে দ্রুত হারে এগিয়ে এসেছে তা অন্য দেশের কাছে শিক্ষণীয়। কিন্তু লাভের সব গুড় খেয়ে যাচ্ছে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতা।

কথায় বলে মানবসম্পদ। এই নামে প্রভাবশালী এক দপ্তরও আছে

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	পরিবার পরিকল্পনা/কল্যাণ খাতে সরকারি বিনিয়োগ (কোটি টাকার হিসেবে)
প্রথম (১৯৫১-১৯৫৫)	০.৬৫
দ্বিতীয় (১৯৫৬-৬১)	৫.০০
তৃতীয় (১৯৬১-৬৬)	২৭.০০
চতুর্থ (১৯৬৯-৭৪)	২৮৫.৮০
পঞ্চম (১৯৭৪-৭৯)	৪০৮.৯৮
ষষ্ঠ (১৯৮০-৮৫)	১৩০৯.০০
সপ্তম (১৯৮৫-৯০)	২৮৬৮.০০
অষ্টম (১৯৯২-৯৭)	৬১৯৫.০০
নবম (১৯৯৭-২০০২)	১৪,১৭০.০০
দশম (২০০২-২০০৭)	৫৮,৯২০.৩০
একাদশ (২০০৭-২০১২)	১,৩৬,১৪৭.০০

এই বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচা করে আমরা জনসংখ্যা বা জন্মহার নিয়ন্ত্রণে কতটুকু উপকার পেয়েছি, তা আগেই দেখেছি। এবার দেশভিত্তিক এক ছোট্ট তুলনামূলক হিসেব দিই। এই তুলনার ভিত্তি দেশবাসীর প্রজনন হার (Total Fertility Rate) যা মাথা-পিছু সন্তান সংখ্যার এক ধারণা দেয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায়। কিন্তু ভারতের এই বিপুল জনসংখ্যাকে এখন আর কি সম্পদ হিসেবে মনে করা যায়?

ক্রমবর্ধমান এই জনগোষ্ঠী বরং ভারতবর্ষের এক বোঝা। তার দারিদ্র্যের, তার পেছিয়ে পড়ার একটিমাত্র কারণকে যদি চিহ্নিত করতে হয়, তবে তা জন্মনিয়ন্ত্রণ। দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য সবার চেয়ে বেশি প্রয়োজন কী? এক্ষেত্রেও উত্তর একই। জন্মনিয়ন্ত্রণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ।

অথচ জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা এখনও সেরকমভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে কোথায়? আমাদের রাজনৈতিক নেতারা, নীতি-নির্ধারক আমলারা, নানান মিডিয়ার সাংবাদিকরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি, পরিকল্পনা, নিউজপ্রিন্ট কত কত বিষয়ে অবিরত খরচ করে চলেছেন : কৃষি সারে ভর্তুকি থেকে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের প্রস্তুতি ক্যাম্প, বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ থেকে টিভি অনষ্ঠানের অশালীনতা। কিন্তু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তাঁদের বিশেষ কথা নেই। পরিচিত দোকানে কন্ডোম কিনতে আসা যুবকটির মতোই তাঁদের সংকোচ।

নেতাদের নিষ্ক্রিয় করে রেখেছেন প্রয়াত সঞ্জয় গাঁধি

সেই ১৯৫২ সালে ভারতবর্ষই বিশ্বে প্রথম সরকারিভাবে এক জাতীয় জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী গ্রহণ করে। তারপর থেকে প্রতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই খাতে সরকারি বিনিয়োগ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে প্রায় আমাদের জনসংখ্যার মতোই :—

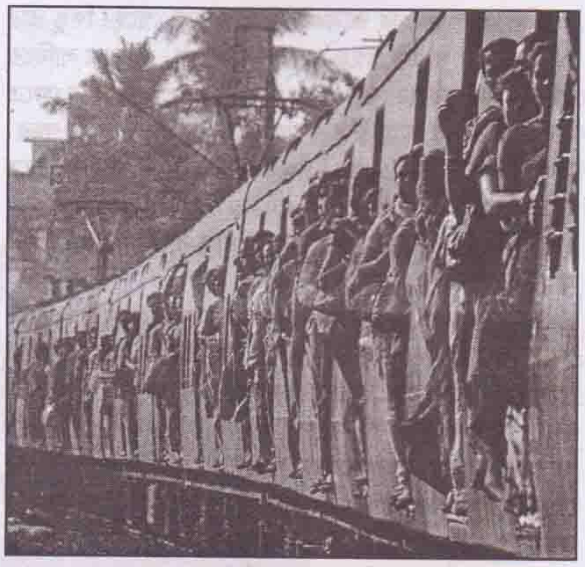

দেশ	১৯৭০	২০০৮
ভারত৫.৫	২.৬	
বাংলাদেশ	৭.০	২.৩
শ্রীলঙ্কা	৪.৩	২.৩
চিন	৫.৮	১.৯

এই তুলনা স্পষ্ট করছে, জন্মনিয়ন্ত্রণের পেছনে এত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে আমাদের লাভ হয়েছে কত সামান্য। পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সরকারি উদ্যোগ এবং বিনিয়োগ যদি প্রথমাবধি শূন্য হত তাহলেও এর চেয়ে খুব খারাপ হত কি?

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর এমন শম্বুক গতি দেখে অধৈর্য হয়েছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গাঁধি। তাঁর আগ্রহের সততা কেমন ছিল সে প্রশ্ন এখন অবান্তর। জরুরি অবস্থার সময়ে তাঁর প্রশ্রয়ে এবং পুত্র সঞ্জয়ের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় দেশজুড়ে যে জঙ্গী জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী, বিশেষত পুরুষের জবরদস্তিমূলক 'নাসবন্দী' অপারেশনের উদ্যোগ, নেওয়া হয়েছিল তা আজ কলঙ্কিত ইতিহাস। কবি শঙ্খ ঘোষের শাণিত কলমে সেই হঠকারী সময়ের কথা ধরা রয়েছে :

সারা শহর জুড়ে/দেখে বালা-বালকে
নির্- লজ্জ নিশান/ওড়ে সূর্যালোকে
আজ সবাই মিলে/মাতে মহোৎসবের
লাল হলুদ নীলে/আর পরশুরামের
ভীম কুঠার হাতে/গায় দু'হাত তুলে
চাই সৃষ্টিহরণ/চাই সৃষ্টিহরণ
সারা শহর জুড়ে/চাই সৃষ্টিহরণ
যত নপুংসকের/নির্- বীর্যীকরণ।

[চালচলন। মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়]

এখনকার জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকে লেখা হয়, "The disastrous forcible sterilization campaign of 1976 led to the Congress defeat in 1977 [Parliamentary] election." (Park's Textbook of Preventive and Social Medicine, 2011. Pg 478)।

গাঁধি মাতা-পুত্রের সেই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ভারতীয় পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর মূলত দুটি সুদূরপ্রসারী ক্ষতি হয়েছে।

প্রথমত, পুরুষদের নির্বীর্যকরণ বা ভ্যাসেকটমি অপারেশন সম্পর্কে গোটা দেশে এক দীর্ঘস্থায়ী বিরূপতার সৃষ্টি। শুধু অন্যায় গা-জোয়ারির স্মৃতি নয়, পাইকারি হারে অপারেশন করতে গিয়ে কখনও অপটু হাতে, আবার কখনও অমনোযোগে, তখন অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। সংক্রমণ, ভুলবশত নার্ভ কেটে যাওয়ায় স্থায়ী পুরুষত্বহীনতা, অপারেশনের ব্যর্থতায় বা অপারেশন উত্তর নির্দেশদানের ব্যর্ততায় স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার ও সেই সূত্রে পারিবারিক ভুল বোঝাবুঝি। এইসব তিক্ত স্মৃতি ভারতবাসী এক গোটা প্রজন্ম ধরে বহন করছে। ফলে আর্থিক ভাতার লোভ দেখিয়েও এই কার্যকর, নিরাপদ পদ্ধতিটিকে কিছুতেই জনগণেশের গ্রহণযোগ্য করে তোলা যাচ্ছে না।

দ্বিতীয় সুদূরপ্রসারী ক্ষতিটি হচ্ছে, জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়টি সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতাদের মনে এক দীর্ঘস্থায়ী আতঙ্ক জন্ম নিয়েছে। যেন, এই নিয়ে উদ্যোগ নিতে গেলেই ভোটারদের বিরাগভাজন হতে হবে। ১৯৭৭ সালে জনতা দল ক্ষমতায় এসে 'জন্মনিয়ন্ত্রণ' শব্দটিকেই হিমঘরে পাঠিয়েছিলেন। 'পরিবার পরিকল্পনা' দপ্তরের নতুন নাম হয়েছিল 'পরিবার কল্যাণ'। সেই থেকে আজ অবধি কোনও প্রথম সারির ভারতীয় দল বা নেতা-নেত্রী জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে কোনও সক্রিয় রাজনৈতিক সদিচ্ছার পরিচয় দেননি।

অবশ্য শুধু জরুরি অবস্থাকে দোষারোপ করে লাভ নেই। হাতে পরম ফায়দা লোটার যে চরিত্র আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আছে তার কথাও মনে রাখতে হবে। বন্যা দুর্গতদের ওষুধ বিলি করা হবে, বড়ো-মেজ-ছোট রাজনৈতিক দাদা-দিদিরা সোৎসাহে হাজির। ম্যালেরিয়া-প্রবণ এলাকায় রক্ত পরীক্ষা করা হবে, অনাবশ্যক তদারকিতে সেখানে স্থানীয় নেতা। হাসপাতালে রোগী ভর্তি করতে হবে, টেবিল চাপড়ে শোরগোল ফেলতে চেলা-চামুন্ডারা সদা প্রস্তুত। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের মতো দীর্ঘমেয়াদী এবং স্পর্শকাতর বিষয়ে তাঁরা 'নিরাপদ' দূরত্বে থাকাই শ্রেয় মনে করেন।

তাই যে বিষয়গুলি জরুরি ভিত্তিতে খোলাখুলি আলোচনা হওয়া দরকার, বা অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, সেগুলি এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। মহিলাদের ঠেলে না দিয়ে পুরুষদেরই স্থায়ী অপারেশনের জন্য এগিয়ে আসা উচিৎ—কোনও রাজনৈতিক নেতা সরাসরি এমন আহ্বান জানাতে চাইবেন না। জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বেশি সন্তানের জন্ম দিলে সে পরিবারের কর্তাকে সামাজিক বা আর্থিক শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। রাজনৈতিক নেতাদের মুরোদ নেই এমন কথা বলার। পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় অনেক পেছিয়ে।ভোট বাক্সের ভ্রূকুটি এসব সত্যের থেকে নেতাদের পিঠ ফিরিয়ে রাখতে বাধ্য করেছে।

রাজনৈতিক সদিচ্ছার এই অভাবের কারণেই ভারতের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন বরাবরই অনেকটা শ্লোগান-নির্ভর হয়েই রয়ে গেছে। গোটা দেশ জুড়ে এক বিশাল সরকারি কর্মীবাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁদের কাজ মানুষদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সচেতনতা জাগানো এবং বিলি বন্টন করা। কিন্তু স্থানীয় নেতৃস্থানীয় মানুষরা এ-ব্যাপারে জনমত গঠনে তেমনভাবে এগিয়ে না আসায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিজস্ব অজ্ঞানতা জনগণের মধ্যে ছড়ানোয় সরকারি বিনিয়োগ আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি।

পরিবার কল্যাণের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্লোগান 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার' সঙ্গে আগে ছবি থাকত এক দম্পতি আর তাঁদের তিন পুত্র-কন্যার। সবারই হাসি মুখ। সুখী পরিবারের এই হাসি আরও সুনিশ্চিত করতে এক ধাপ এগিয়ে স্লোগান ছাড়া হল, 'হাম দো হামারা দো'। একেবারে ইদানিং কালে 'হাম দো হামারা এক'-কেও বাজারে চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

এইসব প্রচার শহুরে উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মানুষকে যতটা প্রভাবিত

করতে পারছে, এখনও পর্যন্ত শহর গ্রামের দরিদ্র মানুষকে কিন্তু মোটেও ততটা পারেনি। ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই এ-কথা কম-বেশি সত্যি।

পরিবার পরিকল্পনা করে গরিব মানুষের কোনও লাভ নেই

আসলে, আমরা পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জনবিস্ফোরণে দেশের কী ক্ষতি হচ্ছে, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিভাবে ভেঙে পড়ছে তাই নিয়েই আলোচনা করি। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত ব্যক্তিগত এক বিষয়। এর পেছনে আছে পরিবারের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ, সুবিধে-অসুবিধের একান্ত ঘরোয়া হিসেব-নিকেশ। দেশের উন্নতির কথা চিন্তা করে কোনও দম্পতি তাঁদের সন্তানের সংখ্যা স্থির করেন না। আর এই ব্যক্তিগত হিসেব-নিকেশ থেকেই সিদ্ধান্তের তফাত হয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছলদের সঙ্গে গরিব মানুষের, শহুরের সঙ্গে গ্রাম্যের।

উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারে সন্তানের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যে প্রস্তুতি তা বেশ সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। তারা রোজগেরে হয়ে ওঠে অন্তত কৈশোর উত্তীর্ণ হলে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্তত বারো ক্লাসের পরীক্ষা পাশ করে। ফলে সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখার পরিকল্পনা নিছক অর্থনৈতিক কারণেই তাঁদের মনে ধরবে।

কিন্তু গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষের কাছে হিসেবটা অন্য। তিনি জমির মালিকই হোন আর দরিদ্র কৃষি শ্রমিকই হোন, পরিবারের সদস্য সংখ্যা বাড়ার অর্থ পরিবারের নিজস্ব কর্মী সংখ্যা বাড়া। তাছাড়া গ্রামের রাজনীতিতে, ব্যালট-নির্ভর বা বুলেট-নির্ভর যা-ই হোক, প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পরিবার বড়ো হওয়া দরকার। আর এই দুই কারণেই অনন্তকাল প্রচলিত বদ্ধমূল সংস্কার ছাড়াও নিতান্ত বাস্তব হিসেবেই পুত্র সন্তানের প্রতি এক পক্ষপাতিত্ব থাকবে। থাকবে পুত্র আকাঙ্খায় এগোতে গিয়ে কিছু অবাঞ্ছিত কন্যা সন্তানের জন্ম।

বিহারের সেই বহু-প্রসবী দেহাতি মায়ের কথা মনে পড়ছে। তিনি হাসি মুখে দাবী করেছিলেন, পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব তাঁরা বোঝেন, তাই দুটি ছেলে হবার পরই তিনি 'অপারেশন' করিয়ে নিয়েছেন। এই দুই পুত্রলাভের লক্ষ্যে পৌঁছতে গিয়ে তিনি যে এর মধ্যে পাঁচটি কন্যারও জন্ম দিয়েছেন, সে-কথা তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি।

গ্রামীণ পরিবারই হোক আর শহুরে দরিদ্র পরিবারই হোক, পুত্রসন্তান কম বয়স থেকে রোজগার শুরু করায় কম বয়সেই সে বিয়ের বাজারে উপযুক্ত পাত্র হিসেবে গণ্য হচ্ছে। অভিভাবকরাও দেখছেন, বিয়ে দিলে গেরস্থালি সামলানোর জন্য আর একজন বাড়তি মানুষ পাওয়া যাবে। মেয়েরবাড়ির লোকেরা দেখছেন, মেয়েকে যখন অন্যের বাড়িতে পাঠাতেই হবে তখন আর তার পড়াশোনা-খাওয়া-পরাইয়ে বেশিদিন খরচ করে লাভ কী? এই পারিবারিক পাটীগণিতের কারণেই এখনও ভারতবর্ষে ১৪-১৫ বছর বয়সে বহু মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান-উত্তরপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে অনেকের বিয়ে হচ্ছে এর চেয়েও কম বয়সে।

এখন এই নব্য স্বামীটির রোজগার শুরু করার তাড়ায় তেমন কোনও শিক্ষাগত প্রেক্ষাপট তৈরি হতে পারেনি। 'বিনোদন' বলতে তার কাছে সিনেমা-টিভির চকচকে রগরগে উত্তেজনা। ঘরে তার সমর্পিত টাটকা বৌ। এই দম্পতির পক্ষে পরিবার পরিকল্পনার উপদেশ মেনে স্ত্রীর বয়স ১৯ বছর হওয়া অবধি প্রথম গর্ভধারণকে দীর্ঘায়িত করা খুব কঠিন।

দরিদ্র পরিবারে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে বুড়ো আঙুল দেখানোর পেছনে আরও এক পরোক্ষ কিন্তু প্রবল হিসেব কাজ করে। তাঁদের পক্ষে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর অর্থ পরিবার পিছু সরকারি আনুকূল্যও বাড়িয়ে নেওয়া শুনতে স্ববিরোধী মনে হলেও এটাই সত্যি যে, জনবিস্ফোরণের মোকাবিলা করার জন্য গরিব মানুষের হাতের প্রধানতম অস্ত্রটিই হল নিজের পরিবারের সদস্য সংখ্যা বাড়ানো। তাঁর পরিবার যত বড়ো হবে জাতীয় সম্পদের তত বেশি অংশে তিনি ভাগ বসাতে পারবেন। এ হল এক দুষ্ট চক্র, যেখানে দারিদ্র্যের কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দারিদ্র্য।

এই হিসেবের সবচেয়ে দুঃখজনক বার্তাটি হল, আমাদের জনসংখ্যা শুধু বাড়ছে না, দরিদ্র-অশিক্ষিত মানুষের অনুপাত দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের সামগ্রিক মানও দ্রুত নেমে আসছে।

রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ

শুধু পারিবারিক হিসেব-নিকেশের মধ্যে এই অদূরদর্শীতা সীমাবদ্ধ নয়। রাজ্যওয়ারি জনগণনার ক্ষেত্রেও এই গুণগত বৈষম্য দেখা যাচ্ছে। সমগ্র দেশজুড়ে প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী চললেও, দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির সঙ্গে গো-বলয়ের রাজ্যগুলির এ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ প্রায় আকাশ-পাতাল তফাত। কেরালা বা তামিলনাড়ুতে যেখানে সামগ্রিক প্রজনন হার (টোটাল ফার্টিলিটি রেট) ২.১-এর স্থিতাবস্তায় কবেই পৌঁছে গেছে যথাক্রমে ১৯৮৮ এবং ১৯৯০তে, বিহার-রাজস্থানের পক্ষে সেখানে পৌঁছতে অন্তত ২০২১ অবধি অপেক্ষা করতে হবে; মধ্যপ্রদেশের লাগবে অন্তত ২০২৫ আর উত্তরপ্রদেশের অন্তত ২০২৭। ২০২১-এর জনগণনার আগেই হয়ত অর্ধেকের মতো ভারতবাসী হবেন এই হিন্দি-ভাষী রাজ্যের অধিবাসী, আর কেরালা-তামিলনাড়ুর মানুষ হবেন মোট জনসংখ্যার মাত্রই ৬ শতাংশের কাছাকাছি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই আনুপাতিক অসঙ্গতি দেশের সার্বিক মান এবং মতপ্রকাশ উভয়কেই প্রভাবিত করছে। ১৯৭৫ সালে লোকসভার ৫৪৫টি আসন বন্টন করা হয়েছিল ১৯৭১-এর জনগণনার ভিত্তিতে। সেক্ষেত্রে মেঘালয়, মিজোরাম, গোয়ার মতো ছোট রাজ্যগুলিকে বাদ দিলে অন্যান্য অংশে প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ ভোটদাতা পিছু একজন লোকসভা সদস্য নির্ধারণ করা হয়েছিল।

এখন ২০১১-র গণনার ভিত্তিতে যদি সেই ৫৪৫টি আসন পুনর্বন্টন করা হয় তবে কোপ পড়বে দক্ষিণের উন্নত রাজ্যগুলোর ওপরেই। সেক্ষেত্রে কেরালা এবং তামিলনাড়ুর লোকসভার সদস্য সংখ্যা

কমে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশের ক্ষেত্রে তা বাড়ার কথা। অর্থাৎ দেশের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক সভায় অগ্রসর, বিবেচক মানুষের প্রতিনিধিত্ব কমবে। দেশের এক সুদূরপ্রসারী নীতির সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য যেন কার্যত তাদের শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে।

সেই লজ্জাজনক আশঙ্কাকে মাথায় রাখলে, জনসংখ্যা নীতি পুনর্বিবেচনার দাবিকে সমর্থন জানাতেই হবে।

তবু আশার আলো

হয়ত একটু বেশি বেশি নিরাশার কথা বলা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই বাস্তব পরিস্থিতিকে অস্বীকার করে সুখী পরিবারের শ্লোগান তোলার কোনও যুক্তি নেই।

আসলে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন বলতে শুধু কিছু চটকদার শ্লোগান তোলা আর সর্বাধুনিক প্রযুক্তি আমদানি নয়। এ হল এক সামাজিক আন্দোলন বা বলা উচিৎ, এক সর্বাঙ্গীন আর্থ-সামাজিক আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ শাখা। সমান গুরুত্বের অন্যান্য অংশগুলি হল : সার্বিক শিক্ষার প্রসার, পরিবারে নারীর মর্যাদা রক্ষা, মা ও শিশুর কার্যকর স্বাস্থ্য পরিষেবা, স্বনিযুক্তি কর্মসূচীর ব্যাপক সুযোগ, এইসব। আর এই সব কিছুর জন্য আগে দরকার আমাদের রাজনৈতিক নেতা ও নীতিনির্ধারকদের সক্রিয় উদ্যোগ।

কথাটা বোধহয় বড়ো বেশি কেতাবি মনে হচ্ছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এই 'Non-contraceptive factors' নিয়ে আলাদা এক বিশদ আলোচনার সুযোগ আপাতত তোলা থাক। আমরা শুধু মনে রাখি, কেরালা বা তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে, ইন্দোনেশিয়া বা শ্রীলঙ্কার মতো প্রতিবেশী রাষ্ট্রে এমন সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমেই জন্মনিয়ন্ত্রণে চমকে দেওয়ার মতো সাফল্য লাভ সম্ভব হচ্ছে।

আমাদের ঘরের কাছেই যখন রয়েছে, এমন উজ্জ্বল আদর্শ তখন আর দ্বিধান্বিত পা ফেলার মানে হয় না। আগে বলা হত, জন্মনিয়ন্ত্রণ হলেই উন্নয়ন হবে; এখন বলা হচ্ছে, উন্নয়ন হলেই জন্মনিয়ন্ত্রণ হবে। সুতরাং এবার সময় এসেছে সমাজের সকল মানুষকে সামিল করে এমন এক সামাজিক আন্দোলনের বাস্তব আহ্বান জানাবার।

আমাদের হাতে সময় নষ্ট করার মতো সময় আর নেই। আমরা জেনে গেছি, এক মিনিট সময় নষ্ট করার অর্থ প্রায় চৌত্রিশ জন নতুন ভারতবাসীর জন্ম, তিন সপ্তাহে প্রায় চন্ডীগড়ের সমান জনসংখ্যা।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে আর নতুন উদ্যমে আমাদের পথ চলা শুরু হোক। এর কোনও বিকল্প শর্ট কাট নেই। এক এক দীর্ঘ দীর্ঘ সফর..... আমরা যেন পারি।

Combating Type *2* Diabetes mellitus

Aditi Bhaduri

While some forms of diabetes are genetically influenced, majority of the diabetes are byproducts of affluent modern society lifestyle. We are embracing a sedentary lifestyle as we are moving away from traditional manual tasks to more technology-driven advancements. Our changing dietary habits and lack of physical activities are contributing to the growing epidemic of Type **2** diabetes, which is now being referred to as the "sitting disease". Excess carbohydrate intake and lack of exercise leads to a state of insulin resistance, a precursor state to pre-diabetes and diabetes. High glyceniic type are usually processed food with refined sugars, white rice and deserts.

Sleep habits are equally important. Sleep-related disorders such as sleep deprivation, poor sleeping habits, and sleep apnea [up to **50%** of the patients with diabetes may have sleep apnea] also contributes to insulin resistance. The progression towards a 24-hour society is making night shift employees more vulnerable to diabetes. Work life imbalance and elevated stress hormones also add to the equation of diabetes.

Common symptoms of prediabetes and diabetes include fatigue, excessive hunger, depression, increased urinary frequency and excessive thirst, among others.

Normal people have fasting blood sugar under **100**, and **2** hours postprandial blood sugar of under **140.** Diabetics, on the other hand, have fasting blood sugar over **126** and over **200, 2** hours after meals.

Diagnosis for diabetes is a simple blood test called hemoglobin Aic. Hemoglobin Aic is an indicator of blood sugar status. Non Diabetic people have hemoglobin Aie under 5.7. Diabetics have hemoglobin Aic over 6. Poorly controlled diabetics have hemoglobin Aic over **7.0.** Those with Aic levels between 5.7 and 6 are considered prediabetic Pre-diabetic individuals are strongly predisposed to diabetes, if lifestyle and dietary interventions are not practiced effectively.

Untreated and poorly controlled diabetes can lead to multitude of complications; they include heart attack, stroke, dementia, depression, neuropathy, poor circulation in the legs